ব্রিফিং নোট

মার্চ ২০২৪

৪

Funded by the European Union

Global Gateway

জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি'র মূল দর্শনই হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা হলো হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ বা সমগ্র সমাজ পদ্ধতি। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া এবং তা ব্যবহারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এই বাজেট মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তারা বাজেট থেকে সুফল পাচ্ছেন কি না এবং স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বাজেটের আওতায় শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বরাদ্দের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে কি না, শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল টার্গেট গ্রুপসমূহ সঠিকভাবে পেল কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। যার ফলাফল উপস্থাপনের লক্ষ্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর সহযোগিতায় স্থানীয় সমাজের নানা অংশীজনদের নিয়ে ২০২৩ সালের ১৬ জুন ঠাকুরগাঁওয়ে "প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতি: আমাদের করণীয়" শীর্ষক একটি নাগরিক সংলাপ আয়োজন করে। সভায় নাগরিক সমাজ, নাগরিক প্রতিনিধি, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় দেড় শতাধিক জনপ্রতিনিধি অংশ নেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

cpd.org.bd

cpd.org.bd

cpdbangladesh

CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি
ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৮১৫৬৯৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে মিড-ডে মিল ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় জোর দিতে হবে

সূচনা বক্তব্য

সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন, সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে তা বোঝার জন্য ২০২২ সালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ঠাকুরগাঁওসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংলাপের আয়োজন করে। এই সংলাপসমূহে সমাজের বিভিন্ন অংশীজন অংশ নেন। বাংলাদেশকে উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে হলে আগামী দিনে কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে সে বিষয়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের আলোচকরা ১০ থেকে ১১ টি বিষয়ে একমত হয়েছেন। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষা। যদি মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে বাদবাকি বিষয়গুলো অর্জন করা সম্ভব হবে না। শুধু শিক্ষা হলেই হবে না, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত হতে হবে। কারণ অনেক শিক্ষার্থী গোল্ডেন এ প্লাস পাচ্ছে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে পারছে না। এর গোড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল প্রাথমিক শিক্ষা যদি ভালো না হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপের শিক্ষাগুলো ভালো হওয়ার সুযোগ থাকে না। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে বুনিয়াদি শিক্ষা। সেইখানে আমরা নজর দিতে পারছি কি পারছি না, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই চিন্তা থেকে স্থানীয় অংশীজনদের নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়নের একটি প্রয়াস হচ্ছে এই সংলাপ। এ সংলাপের আগে যে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, সেখানে শিক্ষকদের নানা সমস্যা, অবকাঠামোগত সমস্যা, পাঠ্যক্রমের যথার্থতা, মিড-ডে মিল চালু করাসহ প্রাথমিক শিক্ষার নানা খুঁটিনাটি বিষয় উঠে এসেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কারিগরি শিক্ষা চালুর প্রস্তাব

আলোচনায় অংশ নিয়ে একটি প্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই কারিগরি শিক্ষা চালু করা উচিত। এটি কেবল প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে নয়, সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। কারণ শিশু বয়সে কোনো কিছু আয়ত্ত করার সক্ষমতা বেশি থাকে। তাই এ বয়স থেকেই কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে শিশুদের আগ্রহী করে তুলতে হবে।

ঝরে পড়া রোধে পদক্ষেপ নিতে হবে

গবেষণায় উঠে আসে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো উল্লেখযোগ্য হারে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। সামাজিকভাবে শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ দূরীকরণের উদ্যোগ ও ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে। ঝরে পড়া রোধে যে সকল এলাকায় দারিদ্র্যের হার বেশি, সে সকল এলাকায় উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে। গবেষণা থেকে জানা যায়, মোট ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের তুলনায় সামান্য

বেশি হলেও ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের সমান (১৫.৫%)।

এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি জানান, তিনি একটি আদিবাসী বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির পরই ঝরে পড়ে। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, মূলত পারিবারিক আর্থিক অসংগতির কারণেই তারা ঝরে পড়ে। এছাড়া পরিবারের সচেতনতার অভাবও এজন্য অনেকখানি দায়ী। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য শিক্ষা প্রণোদনা হিসেবে তাদের পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। দুস্থ, আদিবাসী ও দলিত পরিবারের জন্য এটা করা হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ

একজন আলোচক বলেন, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সপ্তাহের একটি দিন নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে।

সচ্ছল পরিবারের শিশুরা শহরে চলে যাচ্ছে

আলোচকরা জানান, গ্রামের একটু সচ্ছল পরিবার তাদের ছেলে-মেয়েদের আর গ্রামের স্কুলে পড়াতে চায় না। তারা শহরের স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। বিশেষ করে কিন্ডারগার্টেনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভালো মানের শিক্ষক দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো শহরমুখীতা কমে আসবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার স্থাপনের প্রস্তাব

প্রাথমিক শিক্ষা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞান বিষয়ের একজন প্রশিক্ষক জাপানের একটি প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণি থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয় এবং প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বিজ্ঞানাগার আছে। প্রথম শ্রেণি থেকেই শিশুরা বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করে। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার বলে কিছু নেই। আমাদের দেশে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও বিজ্ঞানাগার নেই। সে কারণে আমরা বিজ্ঞানে অনেক পিছিয়ে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি স্কুলে সম্ভব না হলেও উপজেলা পর্যায়ে হলেও যদি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে সেখানে সপ্তাহে এক দিন বা দুই সপ্তাহ অন্তর এক দিন শিশুদের সেখানে নিয়ে গিয়ে ল্যাব ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রগতি সাধিত হবে।

বিদ্যালয়ের বরাদ্দ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে

আলোচনায় অংশ নিয়ে একজন গণমাধ্যমকর্মী বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রতিবছর নানা রক্ষণাবেক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সে অর্থ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান অরুণাংশ দত্ত টিটো বলেন, প্রতি বছর একটি বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজের জন্য স্কুলে বরাদ্দ আসছে। আগে এই অর্থের যে ব্যবস্থাপনা ছিল, এখন তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। দুই বছর আগে এ বিষয়ে নীতিমালা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, স্কুলে কী ধরনের সংস্কার কাজ প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করবেন উপজেলা প্রকৌশলী এবং তার তত্ত্বাবধানেই সংস্কার কাজ পরিচালিত হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এখন অস্বচ্ছতার কোনো সুযোগ নেই।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর অকেজো

গবেষণায় উঠে আসে একটা বড় সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নেই বলে মাল্টিমিডিয়া ও ল্যাপটপের মাধ্যমে যে নানামুখী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে, তা ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা কর্মকর্তার তথ্যমতে, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৪০৭ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮৯ টি বিদ্যালয়ে ওয়াইফাই সংযোগ আছে। বাকি ১১৮ টি বিদ্যালয়ে মডেম এবং প্রতিমাসে ২০ জিবি ইন্টারনেট বিল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে এক গণমাধ্যমকর্মী বলেন, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর অকেজো হয়ে রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ৫৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে তিনি ৩৯ টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর পেয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র একটি বিদ্যালয়ে প্রজেক্টর সচল আছে এবং সেটির মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। বাকি বিদ্যালয়গুলোর প্রজেক্টর অকেজো। সাতটি বিদ্যালয়ে দেখা গেছে, যেদিন সেটি হস্তান্তর করা হয়েছে, সেদিনই তা নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো জনবল নেই। প্রধান শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের অফিস সহকারীর বাড়িতে এগুলো থাকে।

এ বিষয়ে একজন উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার জন্য আমরা যেসব ডিজিটাল ডিভাইস সরকারের তরফ থেকে পাই, সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সুযোগ থাকে না। সরকারি যেসব ল্যাপটপ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেগুলো দেখা যায় যে সচল করা যাচ্ছে না। এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করার জন্য সরকারি কোনো বরাদ্দ থাকে না। ফলে পরবর্তী বছরের বরাদ্দ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

এ বিষয়ে একজন শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, বরাদ্দের বিষয়টি বড় সমস্যা নয়। একজন শিক্ষকের যদি মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম চালানোর দক্ষতা থাকে, তাহলে সেটি আর অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের দক্ষতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বাংলা ও ইংরেজি পঠনে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে না

উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার উল্লেখ করেন, বিভিন্ন জরিপের ফলাফলে উঠে এসেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে তাদের পাঠ্য বইয়ের বাংলা বা ইংরেজি রিডিং পড়তে পারে না। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে এ সমস্যা বেশি। ওইসব অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার বেশি এবং অভিভাবকরা অসচেতন।

এ বিষয়ে একজন প্রধান শিক্ষক বলেন, আমরা শিশুদের বাংলা ও ইংরেজি পড়া শেখানোর জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি। কিন্তু শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা নেই। দুই-তিন দিন আসার পর অনেক শিশু অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এর ফলে তাদের পঠন

দক্ষতার উন্নতি হচ্ছে না। এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা সচেতন নয়। স্কুলে শিশুদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হলে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি বাড়ানো যাবে বলে মনে করেন তিনি।

আরেকজন শিক্ষক উল্লেখ করেন, তিনি একটি শ্রেণিকক্ষে ইংরেজিতে রোল কল করছিলেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা ইংরেজি গাণিতিক অঙ্কগুলোর উচ্চারণ বা ওয়ান, টু, থ্রি ইত্যাদি শুনে বোঝে না। ফলে তাদের অধিকাংশ চুপ থাকে। এরপর তিনি যখন এক, দুই, তিন - এভাবে বাংলায় রোল কল করা শুরু করলেন, তখন সবাই তাদের রোল নম্বর অনুযায়ী সাড়া দিল। তার মানে শিশুরা ইংরেজিতে ন্যূনতম গণন দক্ষতাও অর্জন করতে পারছে না। শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই ইংরেজিতে দুর্বলতা নিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ানোর জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় না। আর অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের দু'বেলা খাবারই জোটে না। ফলে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা করতে পারে না, যা শিশুদের ইংরেজিতে দুর্বলতার অন্যতম কারণ। অন্যদিকে সচ্ছল পরিবারের শিশুরা এক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে।

আরেক বক্তা উল্লেখ করেন, বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত দুর্বল। শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শেষে ওপরের ক্লাসে গিয়ে তারা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

এ বিষয়ে একজন শিক্ষা কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, শিক্ষকদের মধ্যে যদি স্ব-প্রণোদিত দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হয়, তাহলে কেবল মনিটরিং বাড়িয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকেও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি কোনো বিষয়ে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ওই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

কোভিডকালের শিখন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপ নিতে হবে

একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাধ্যমিক ও অন্যান্য স্তরে মাঝে মাঝে বিদ্যালয় চালু করা হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় পুরোপুরি বন্ধ ছিল ২০২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। এর ফলে শিশুদের ব্যাপক শিখন ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে উদ্যোগ খুব বেশি কার্যকর হয়নি।

এ বিষয়ে গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিদ্যালয়ে কোভিড-পরবর্তী পুনর্বাসন সহায়তা এসেছে, এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতভাগ ছিল না। জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহ কোভিড-পরবর্তী কোনো অনুদান পায়নি বলে জানিয়েছেন ৬১ শতাংশ উত্তরদাতা।

এ বিষয়ে প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়, কোভিড সময়কালে শিখন ক্ষতি বিবেচনায় আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কিন্তু এখনো বিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষ কোনো কার্যক্রম নেই। এক্ষেত্রে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষকদের সরকারিভাবে যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে

একজন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে সত্য, তবে এখন অনেক দক্ষ জনবল এ খাতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখন যদি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে একসময় প্রাথমিক শিক্ষা একটি মানসম্পন্ন পর্যায়ে পৌঁছাবে। একজন প্রধান শিক্ষকও এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সেটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনসমষ্টি ও অন্যান্য অংশীজনকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা আরও বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি। আরেকজন প্রধান শিক্ষক উল্লেখ করেন, বিভিন্ন ফসলের মাড়াই মৌসুমে শিক্ষার্থীদের যাতে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যায়, সেজন্য বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবকদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

বৈরাগীর আখড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, শিক্ষক, অভিভাবক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রায় ৯০ ভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পেরেছিলাম। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল ঘন ঘন অভিভাবক সমাবেশ।

এ বিষয়ে অরুণাংশ দত্ত টিটো বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক নারী। তাদের পক্ষে দূর-দূরান্তের স্কুলে গিয়ে পাঠদান করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিজ ইউনিয়ন অথবা পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে পদায়ন করা উচিত। যেসব কারণে শিক্ষকরা সময়মতো স্কুলে উপস্থিত হতে পারেন না, তার মধ্যে এটি অন্যতম কারণ।

নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও আদর্শ শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

এ বিষয়ে একটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য প্রশ্ন রেখে বলেন, বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন উন্নত নয়। ওখানে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস নেন। আর পড়ালেখার খরচও অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও সেখানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি এবং অভিভাবকদের আগ্রহও বেশি। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে কেন শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হচ্ছে না এবং পড়ালেখার মান ভালো হচ্ছে না, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি জানান তিনি।

এ বিষয়ে একজন সাংবাদিক উল্লেখ করেন, সরকারি বিদ্যালয়ে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও আদর্শ শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এর ফলে অনেক উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও তারা আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পড়ান না। এতে করে ভালো শিক্ষার্থীরা সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে আসছে না এবং সচেতন অভিভাবকরা সেখানে তাদের সন্তানদের পাঠাচ্ছেন না।

আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় বৈষম্যের শিকার

আলোচনায় অংশ নিয়ে একজন সাংবাদিক বলেন, উপজেলায় তিনটি আদিবাসী স্কুল রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কার্যক্রম বন্ধ প্রায়। সেখানকার শিক্ষকরা ঠিকমতো বেতন-ভাতা পান না। শিক্ষার্থীরাও সরকারি সুযোগ-সুবিধা পায় না। একই পরিস্থিতি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। সেখানকার শিক্ষকরাও ঠিকমতো বেতন-ভাতা পান না। এক্ষেত্রে আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলো বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

স্কাউটিং ও সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে

গবেষণায় দেখা যায়, বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/ইন্সট্রাক্টর নেই বলে জানিয়েছেন ৮৯ শতাংশ উত্তরদাতা। ফলে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা কোন কোন শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আবারও জনবল সংকট ও আর্থিক বরাদ্দের অপ্রতুলতার কথা বলেছেন। কিন্তু নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও স্থানীয় বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

এ-সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে স্কাউটিং কার্যক্রম রয়েছে, সেটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এ কার্যক্রমটি আরও জোরালোভাবে পরিচালনা করা আবশ্যক। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোয় পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মতো সহশিক্ষা কার্যক্রমে আরও বেশি গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাবে।

অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে জোর দিতে হবে

বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তবে কিছু বিদ্যালয়ে ভবন অনেক পুরোনো হওয়ায় সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এবং পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে টিনের চালা দিয়ে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই চালা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে পাঠদান বিঘ্নিত হয়। যেসব বিদ্যালয়ে পুরোনো ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে ভবন নির্মাণ করা আবশ্যক বলে সংশ্লিষ্টরা উল্লেখ করেন।

আরেক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য জানান, তার বিদ্যালয়েও পর্যাপ্ত ভবন নেই। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট একটি ভবন আছে। এখন আরেকটি ভবন না করা হলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে টিন শেডের ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনায় পাঠদান চলছে।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বলেন, বর্তমানে স্কুলগুলোর অবকাঠামোগত সমস্যা নেই বললেই চলে। আগে তো বাঁশের বেড়া দেওয়া স্কুলঘর ছিল। কিন্তু বর্তমানে কংক্রিটের দালান ব্যতীত বিদ্যালয় নেই বললেই চলে। এছাড়া বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরও ছিল না। বর্তমানে ধীরে ধীরে সীমানা প্রাচীর তৈরি হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা জমি দিয়েছেন তাদের অনেকেই রেজিস্ট্রি করে দেননি। ফলে ওই দাতাদের উত্তরাধিকাররা জমির মালিকানা দাবি করে জমি দখল করে নেন। এ সমস্যা এখনো আছে। এ থেকে স্কুলের জমি রক্ষায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা জরুরি।

ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বিদ্যোৎসাহীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

বক্তারা বলেন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে যদি অভিজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তাহলে সেই কমিটি শিক্ষার মানোন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারবে না। কেবল রাজনৈতিক বিবেচনায় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য বাছাই করা কাম্য হতে পারে না।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির বিষয়ে অরুণাংশ দত্ত টিটো বলেন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কিছু সমস্যা আছে। তিনি উল্লেখ করেন, ৩০ জুনের মধ্যে বরাদ্দের টাকা ওঠাতে না পারলে সেই অর্থ ফেরত চলে যায়। কিন্তু বরাদ্দে টাকা উত্তোলনের চিঠি স্কুলে পৌঁছায় ২৫ জুন। মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে স্কুলের কী ধরনের উপকরণ ও সরঞ্জাম লাগবে, তা হিসাব করে বাজেট তৈরি করে শিক্ষা অফিসে পাঠাতে হয়। সরকারি কাজে যেমন নানা দুর্নীতি হয়, তেমনি এর কাগজপত্রের ঝামেলাও অনেক। এভাবে তাড়াহুড়ো করে কাজ করার ফলে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যরা প্রধান শিক্ষককে সন্দেহের চেখে দেখেন। হয়তো একজন সদস্য অভিযোগ দিলেন যে, প্রধান শিক্ষক দুর্নীতি করছেন। তখন ওই বরাদ্দের অর্থ প্রাপ্তি নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে স্পষ্ট নীতিমালা থাকা আবশ্যক।

তিনি বলেন, বিদ্যোৎসাহী সদস্য ও কমিটির অন্যান্য সদস্যের উচিত যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেওয়া। কিন্তু তারা কি সে দায়িত্ব পালন করছেন?

নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করার প্রস্তাব

আলোচনায় অংশ নিয়ে একজন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বলেন, সামাজিক অবক্ষয় রোধে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শিশুদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের পাঠ্যক্রমে এ বিষয়টি আছে। কিন্তু নৈতিক শিক্ষার ক্লাস হয় টিফিন পিরিয়ডের পরে। ওই সময় শিশুরা অনেক ক্লান্ত থাকে। আর মিড-ডে মিল ব্যবস্থা না থাকায় তারা ক্ষুধার্ত থাকে। এমন পরিস্থিতিতে নৈতিক শিক্ষার ক্লাসে তাদের মনোযোগ থাকে না। তাই নৈতিক শিক্ষার ক্লাসগুলো সকালের দিকে হওয়া উচিত।

শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে

আলোচনায় অংশ নিয়ে এক বক্তা বলেন, একটি বিষয় উঠে আসছে যে, সচ্ছল পরিবার ও একটু অগ্রসর পরিবারের ছেলেমেয়েরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে না। এক্ষেত্রে ভালো মানের শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিতকল্পে শিক্ষা খাতে কর্মরত অফিসার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো বাধ্যতামূলক করা উচিত। এর পাশাপাশি ভালো শিক্ষকদের পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। তাহলে অন্য শিক্ষকরা ভালোভাবে পাঠদানে মনোযোগী হবেন।

বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ দ্রুত পূরণ করতে হবে

একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলেন, ঠাকুরগাঁও সদরে ৪০৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর প্রায় অর্ধেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। এসব পদ বর্তমানে শূন্য হয়ে রয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষক অবসরে চলে গেছেন। আবার অনেকে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৭ সালে তিনি যে বিদ্যালয় থেকে অবসরে গিয়েছিলেন, সেই বিদ্যালয়ে এখনো প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন গ্রেড দশম গ্রেডে উন্নীত করার ঘোষণা দেওয়া হলেও তা এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। অতিসত্বর তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের পদোন্নতি হয় না। পদোন্নতির এ জট খোলার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ রোধে পদক্ষেপ নিতে হবে

একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, অভিভাবকরা অসচ্ছল হওয়ায় ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত-খামারের কাজে নিয়োগ করেন। অর্থাৎ পারিবারিক-ভাবে শিশুশ্রম হচ্ছে। বিশেষ করে মরিচ, ভুট্টা ও ধান মাড়াই মৌসুমে শিশুদের কর্মে নিয়োগ করা হয়। এতে করে শিশুরা পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়ে।

বাল্যবিবাহের বিষয়ে আলোচকরা বলেন, যেসব অভিভাবকের মধ্যে শিক্ষার হার কম, তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের হার বেশি। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা যদি একটু আন্তরিকতার সঙ্গে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাহলে বাল্যবিবাহ রোধে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা সমাধান করা কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব নয়।

নতুন সরকারি স্কুলে জনবল সংকট

শিক্ষকরা জানান, পুরোনো সরকারি স্কুলগুলোয় দপ্তরির পদ থাকলেও নতুনভাবে সরকারিকরণ হওয়া বিদ্যালয়ে তা নেই। ফলে প্রধান শিক্ষককে শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরের কাজে অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। নতুন সরকারি স্কুলগুলোতেও পুরোনো স্কুলগুলোর সমপর্যায়ের জনবল নিয়োগ দেয়ার দাবি জানান শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে একজন শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষকদের কেবল পাঠদানেই ব্যস্ত রাখতে হবে। আমরা প্রতিনিয়ত তাদের কাছে নানা তথ্য চাই। এই তথ্য সরবরাহের জন্য তাদের অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়। এই কাজের জন্য বিকল্প জনবল নিয়োগ দিয়ে শিক্ষকদের পাঠদান কাজে আরও বেশি মনোনিবেশ করার সুযোগ করে দিতে হবে।

উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তিতে জটিলতা

এ বিষয়ে একজন প্রধান শিক্ষক উল্লেখ করেন, আগে উপবৃত্তির টাকা দেওয়া হতো হাতে হাতে। এখন সেটি দেওয়া হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা ঠিকমতো সেই অর্থ পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে তারা প্রায়ই স্কুলে এসে অভিযোগ করেন। কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের সুযোগ শিক্ষকদের নেই। কারণ এটি নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চপর্যায় থেকে।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের চাহিদা বাড়ছে

ঠাকুরগাঁওয়ের রামকৃষ্ণ বর্মণ বলেন, আগে কিন্ডারগার্টেন স্কুল বলে কিছু ছিল না। বর্তমানে সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত তারা সবাই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই উঠে এসেছেন। তবে কিন্ডারগার্টেন স্কুল হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। দেশে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় অনেকে পড়ালেখা শেষ করে এ ধরনের স্কুল খুলেছেন। আবার সেসব স্কুল খোলা হয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আশেপাশেই। এখন যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো, তারা তাদের ছেলেমেয়েদের এসব কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করাচ্ছেন। সচ্ছল পরিবারের অভিভাবকদের ধারণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভালো পড়ালেখা হয় না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক আসছেন

রামকৃষ্ণ বর্মণ বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া গ্র্যাজুয়েটরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আসছেন। এমন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ হলে অচিরেই প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র পাল্টে যাবে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কেবল ভালো শিক্ষক নিয়োগ হওয়ার ফলে ঠাকুরগাঁও-এর হরিপুরের প্রত্যন্ত একটি বিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে মনোনীত হয়েছে।

একজন অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি বই পড়তে পারে না এবং তাদের পর্যায়ের অংকগুলো সমাধান করতে পারে না। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন। তা সত্ত্বেও যে কারণে শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না, তার কারণ হলো মনিটরিংয়ের অভাব।

প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য ও সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী রমেশচন্দ্র সেন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ অগ্রগতি হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও হবে। আর শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে খুবই স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অব্যবস্থাপনার সুযোগ নেই। এই শিক্ষকরা যদি স্কুলগুলোয় সঠিকভাবে পাঠদান করে, তাহলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হতে বাধ্য। শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনি প্রতিবছর শিক্ষা-বিষয়ক সেমিনার আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মানসম্পন্ন শিক্ষার ভিত রচনা করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়েই

সমিরউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বেলাল রব্বানী বলেন, কলেজে পড়াতে গিয়ে আমরা যখন দেখলাম শিক্ষার্থীরা তাদের ওই পর্যায়ের শিখন দক্ষতা অর্জন না করেই কলেজে চলে এসেছে, তখন আমরা মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে না পারার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে দোষারোপ করতে লাগলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল এটি মাধ্যমিকের সমস্যা নয়, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই কম দক্ষতা নিয়ে মাধ্যমিকে আসছে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তুমুল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ

দেওয়ার পরও এ সমস্যা কেন থেকে যাচ্ছে? আর সামর্থ্যবানরা কেনো কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন? এ ক্ষেত্রে একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সচেতন ও সচ্ছল বাবা-মা তাদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে চান না। এর পেছনে কারণ হচ্ছে, যেসব শিক্ষক নিয়োগ পাচ্ছেন, তারা হয়তো পরীক্ষার মাপকাঠিতে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। কিন্তু শিক্ষকতা যে একটি পেশা এবং শেখানোর জন্য কিছু কৌশল রয়েছে, সে বিষয়ে শিক্ষকরা মনোযোগী হতে পারছেন না। যেসব সফল বিদ্যালয়ের উদাহরণ এখানে এসেছে, সেগুলোতে গেলে দেখা যাবে, তাদের পাঠদানের কৌশল অন্যদের থেকে ভিন্ন।

এ বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন, শিক্ষকতা একটি কৌশল। অনেক শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের যেভাবে পড়িয়ে দেন তাতে করে বাড়িতে গিয়ে তাদের আর পড়া লাগে না। এজন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে আরও বেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পিটিআই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়। কারিকুলাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে

গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য বিভিন্নমুখী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় বলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলেছেন। এক্ষেত্রে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিভিন্ন মেয়াদি পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল এবং পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া হয়। শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ পরীক্ষা। পরীক্ষায় নকল হওয়ার বিষয়ে প্রায় ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়েছেন। শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন সাপেক্ষে যারা পিছিয়ে পড়ছে বা যাদের শিখন ক্ষমতা ধীর গতিসম্পন্ন তাদের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনার কথা জানা যায়নি।

এ বিষয়ে বেলাল রব্বানী বলেন, কিন্ডারগার্টেনে দেখা যায়, মানসম্পন্ন শিক্ষক নেই। সেখানে যারা শিক্ষকতা করেন, তারা নিজেরাও ছাত্র। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় তারা তেমন কিছুই নন। তারপরও সেখানে ভালো পড়ালেখা হচ্ছে কীভাবে? এর কারণ হলো সেখানে শিক্ষকরা সনদভিত্তিক যোগ্যতায় পিছিয়ে থাকলেও শিশুদের পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক। সেখানে শিশুদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে রাখা হয়। ওইসব শিশুর অভিভাবকরাও সচেতন এবং বিদ্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে একটি পঠন পরিকল্পনা অনুসরণ করে সে অনুযায়ী শিশুদের নানাভাবে পাঠদান করা হয়।

গ্রাম-শহরের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান

বেলাল রব্বানী বলেন, গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটি বৈষম্য রয়েছে। সচ্ছল ও সচেতন অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের শহরের স্কুলে ভর্তি করান। গ্রামের সচ্ছল পরিবারগুলো শহরে চলে যাচ্ছে। গ্রামে থেকে যাচ্ছে কেবল দরিদ্র, স্বল্প-শিক্ষিত ও অসচেতন মানুষ। তাদের মধ্যে শিশুদের পড়ালেখা করানোর আগ্রহ কম। শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। এ পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষকদের ভূমিকা নিতে হবে।

ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার মানোন্নয়নে মিড-ডে মিল চালু করতে হবে

জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহ এবং অন্যান্য তথ্যপ্রদানকারী প্রত্যেকেই শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল চালু করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি যেমন বাড়বে, তেমনি বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হারও কমবে। পুষ্টির চাহিদা অনেকাংশে পূরণের পাশাপাশি দরিদ্রতার কারণে বাল্যবিবাহের প্রবণতাও অনেক ক্ষেত্রে কমে আসতে মিড-ডে মিলের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষণা জরিপে অংশগ্রহণকারীরা।

বেলাল রব্বানী বলেন, আমি একটি আদিবাসী স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা সকালে কী খেয়ে এসেছ? তাদের অধিকাংশ উত্তর দেয়, তারা চা আর মুড়ি খেয়ে স্কুলে এসেছে। আর দু-একজন জানায়, তারা রুটি বা পান্তা ভাত খেয়ে এসেছে। সকালের ওই খাবার খেয়ে এসে তারা সারাদিন স্কুলে থাকবে। এতে তো তাদের পুষ্টি সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং তাদের চেহারায় অপুষ্টির ছাপ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে স্কুলে যদি মিড-ডে মিল চালু করা যায়, তাহলে শিশুদের পুষ্টির উন্নতি হওয়ার পাশাপাশি স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাবে। এর আগে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি চালু হওয়ার পর তাদের ঝরে পড়ার হার কমেছিল। শিক্ষার উন্নয়নে উপবৃত্তির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। মিড-ডে মিলও তেমন একটি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মিড-ডে মিল চালু করা হলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়ন শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়বে বলে উল্লেখ করেন অরুণাংশ দত্ত টিটো।

এ বিষয়ে সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো এবং নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নতি ঘটাতে হলে অবশ্যই স্কুল ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। একজন উল্লেখ করেন, শিশুরা মুড়ি খেয়ে স্কুলে আসছে। এরপর স্কুলে আসার পরে শিশুরা ক্ষুধার্থ থাকে। এভাবে অভুক্ত থাকলে তারা তাদের শিখন ক্ষমতা অনুযায়ী শিখতে পারবে না। স্কুল ফিডিং বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা আছে। কিছু জায়গায় এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালুও করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এবারের বাজেটে এ বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

পাঠ্যক্রম বারংবার পরিবর্তন কাম্য নয়

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, ৪২ বছরের শিক্ষকতা জীবনে যে সমস্যার মুখোমুখি সবচেয়ে বেশি হয়েছি, তা হচ্ছে পাঠ্যক্রম দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া। একটি পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করার কয়েক বছরের মধ্যে সেটি পরিবর্তন করে নতুন আরেকটি পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঠিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিবন্ধকতা। কারণ একটি পাঠ্যক্রম থেকে সুফল পাওয়ার আগেই সেটি পরিবর্তন করে ফেলা হয়। নীতিনির্ধারকরা কী চিন্তা করে এমনটি করেন তা আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে অরুণাংশ দত্ত টিটো বলেন, একটি কারিকুলামে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাইন্ডসেট তৈরি হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করে সেটি বদলে আরেকটি চালু করা হয়। এ যেন গিনিপিগের মতো পরীক্ষা চলছে। কারিকুলাম বারবার পরিবর্তন করা হলে শিক্ষকরা কীভাবে পাঠদান করবেন?

এসডিজি বাস্তবায়ন ও বৈষম্য রোধে প্রাথমিক শিক্ষায় জোর দেওয়ার বিকল্প নেই

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের আরও ১৯২ টি দেশের মতো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের দলিলে স্বাক্ষর করেন। এসডিজিতে মোট ১৭ টি অভীষ্ট এবং ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই অভীষ্টগুলোর মধ্যে শিক্ষা হচ্ছে চতুর্থ অভীষ্ট। এই এসডিজি বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মে দেশের মোট ১৩০ টি সংগঠন যুক্ত। প্ল্যাটফর্মের সেই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, ২০৩০ সালের মধ্যে যদি এসডিজি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই একটি দেশে উন্নীত হবে। সেক্ষেত্রে এসডিজি-৪-এ মানসম্পন্ন শিক্ষার যে অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি উল্লেখ করেন, দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের আয়বৈষম্য ও সম্পদবৈষম্য বাড়ছে। এর পেছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে আমরা মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে পারছি না। শিক্ষায় বড় ধরনের বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। এই এসডিজির একটি মূলমন্ত্র হচ্ছে, কাউকে পেছনে রাখা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশে এক্ষেত্রে একটি বিভাজন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান থাকা। এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে, তা হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। যে বিষয়টি এসডিজির ৪.২ লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক-প্রথমিকে যে বিষয়টি ঠিক করার কথা, সেটি প্রাথমিকে গিয়ে ঠিক করতে গেলে হবে না। এ বিষয়টিকে আমরা খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালে সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ২০২০ সালের মধ্যে শিশুদের জন্য মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে। সেইসময় এটি ছিল ১৫ শতাংশ। এখনো সেটি ১৫ শতাংশেই রয়েছে। এটি যদি ২০ শতাংশে উন্নীত হতো, তাহলে ওই স্কুলে ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হতো।

বৈষম্যমূলক দুই অর্থনীতির তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা যদি প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য দূর করতে না পারি, তাহলে দেশের অভ্যন্তরেই দুই অর্থনীতি তৈরি হয়ে যাবে। একটি বৈষম্য নিরসনমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ওপর আরও বেশি জোর দিতে হবে।

এখন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই প্রাইভেট পড়াতে হচ্ছে

গবেষণায় উঠে এসেছে, বেশ কিছু বছর ধরে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার বাইরে আরও অতিরিক্ত সময় প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠ না নিলে শিক্ষার্থীরা অপ্রত্যাশিতভাবে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ে বলে প্রায়ই শোনা যায়। সেদিক থেকে আলোচ্য জরিপে চিত্রটি অনেকটাই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ঠাকুরগাঁয়ের অরুণাংশ দত্ত টিটো বলেন, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় মোট ৪০৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোয় মোট শিক্ষকের সংখ্যা ২৪৭০ জন। এর মধ্যে সাড়ে ৬৭ শতাংশ শিক্ষক নারী, বাকিরা পুরুষ। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক মিলে উপজেলায় শূন্য পদ রয়েছে ২২৫ টি। বিদ্যালয়গুলোয় ৯৭ হাজার ৪২২ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের আগের প্রজন্ম অর্থাৎ আমরা যেসব স্কুলে পড়ালেখা করেছি, সেসব স্কুলে ভালো মানের ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো ছিল না। তবে আমাদের সময় শিক্ষকরা খুবই আন্তরিক ছিলেন এবং তারা খুব ভালো শিক্ষক ছিলেন। এখন যুগ পাল্টে গেছে। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শিশুদের প্রাইভেট পড়াতে হয়।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বের বোঝা কমাতে হবে

অরুণাংশ দত্ত টিটো বলেন, পর্যায়ক্রমে উপজেলার সব স্কুলে অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। এরই মধ্যে সদর উপজেলার ৫৬ টি স্কুলে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যেসব স্কুলে জায়গা স্বল্পতা আছে, সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এত কিছুর পর কেন মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে না? আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হলো, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নানা প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তিনি উপজেলায় নানা দপ্তরে ছোটাছুটি করে বেড়ান। এর ফলে স্কুলের অন্য শিক্ষকরা উদাসীন থাকেন এবং দায়িত্বে অবহেলা করার সুযোগ পান। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে প্রধান শিক্ষককে স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার দাপ্তরিক ছোটাছুটি কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষকদের বিভিন্ন জরিপের কাজে না লাগিয়ে সে কাজের জন্য পৃথক জনবল নিয়োগ দেওয়া উচিত।

শিক্ষক বদলি নিয়ে জটিলতা

এ বিষয়ে বক্তারা বলেন, অনেক স্কুলে শিক্ষক আছেন, শিক্ষার্থী কম। আবার অনেক স্কুলে শিক্ষার্থী বেশি, কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই। এখন জেলা শিক্ষা অফিস বা উপজেলা শিক্ষা অফিস ইচ্ছা করলেই কিন্তু এই শিক্ষকদের সমন্বয় বদলি করাতে পারেন না। এ বিষয়টি অধিদপ্তরের হাতে। ফলে মাঠপর্যায়ের প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষকদের বণ্টন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

উপসংহার

সংলাপের প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য ও সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন বলেন, এখানে আলোচনা শুনে যে বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে, তার মূল ভাষ্য হলো শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। এই মান বাড়ানোর জন্য নানা সুপারিশের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মিড-ডে মিল চালু করা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আমি এ ব্যবস্থা দেখেছি। কিন্তু সেখানে এই দুপুরের খাবারের আয়োজনের জন্য প্রতিদিন তিন ঘণ্টা সময় অপচয় হয় । তা সত্ত্বেও আমরা মিড-ডে মিলচালু করার কথা বিবেচনায় রেখেছি। আর ঝরে পড়া রোধ করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ১৫-২০ বছর আগে ঠাকুরগাঁওয়ের কিছু কিছু এলাকার ছেলেরা পড়ালেখা করতো না। তারা ক্ষেত-খামারে কাজ করতো বা পারিবারিক কাজে সহায়তা করতো। বর্তমানে ওইসব এলাকার ছেলেমেয়েরা স্কুলমুখী। বাবা-মায়েরা এখন সচেতন হয়েছেন এবং তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। বিগত এক দেড় দশকে ঠাকুরগাঁওয়ে পড়ালেখা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তিনি বলেন, যেভাবেই হোক আমরা শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। এর ফলে এখন এই এলাকার রিকশাওয়ালার ছেলেও বুয়েটে চান্স পাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, আমরা যদি তথ্য-প্রযুক্তির জ্ঞানে

সমৃদ্ধ না হই, তাহলে আমরা উন্নতি করতে পারব না। সেজন্য সরকার তথ্য-প্রযুক্তির শিক্ষার ওপর অনেক বেশি জোর দিচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, একটি শ্রেণিকক্ষে ৪০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকলে সেখানে ভালো পাঠদান করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবশেষে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আজকের এ আলোচনা কোনো ধরনের হতাশার প্রতিফলন নয়, বরং এ আলোচনা হচ্ছে মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন। মানুষ যখন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং প্রত্যাশা করে, তখন সে ভবিষ্যৎ উন্নতিতে বিশ্বাসও করে। এটি বাঙালির সহজাত ধর্ম।

সভাপতি
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রারম্ভিক বক্তব্য
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপক
জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

প্রধান অতিথি
জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি
সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ অতিথি
জনাব রামকৃষ্ণ বর্মন
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঠাকুরগাঁও

সম্মানিত অতিথি
এডভোকেট অরুণাংশু দত্ত (টিটো)
চেয়ারম্যান, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা
জনাব বেলাল রব্বানী
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সমীর উদ্দিন ডিগ্রী কলেজ
জনাব আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
প্রধান শিক্ষক, বি. আখড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সমাপনী বক্তা
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : মোঃ মাসুম বিল্লাহ্
সিরিজ সম্পাদনায় : অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs bdplatform4sdgs